বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান - গোলাম মুরশিদ (সাক্ষাৎকার)



আমার আগেই প্রথম আলোর আলতাফ শাহনেওয়াজ ও আলোকচিত্রী সৈকত ভদ্র পৌঁছে গিয়েছিলেন গোলাম মুরশিদের ধানমন্ডির বাসায়। ছবি তোলাও প্রায় শেষ। আমার পৌঁছানোর কয়েক মিনিট পরে একটি লম্বা টেবিলে তাঁর অনেকটা কাছ ঘেঁষে তাঁকে ঘিরে বসলাম আমরা। কথা শুরু হলো। সম্প্রতি তিন খণ্ডে তিনি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান সংকলনের কাজ শেষ করেছেন; যার মধ্যে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে অমর একুশে বই মেলায়। বাকি দুই খণ্ডও অচিরেই প্রকাশিত হবে। এ নিয়ে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় কয়েকটি সাক্ষাৎকারও দিয়েছেন। সেসব কথার পুনরাবৃত্তি এখানে বাদ রাখা হলো। তবে এই অভিধান-প্রসঙ্গ দিয়েই শুরু হলো আমাদের আলোচনা।

বাংলা একাডেমির ব্যবহারিক বাংলা অভিধান-এ দেখা গেছে যে মূল শব্দটা বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো আছে। কিন্তু একজন পাঠক তো শব্দটি কোথাও বিশেষ্য, কোথাও বিশেষণরূপে পাবেন, নানা রকম রূপে পাবেন। ওই সব রূপ থেকে যদি কেউ শব্দ খোঁজেন তাহলে নানা রকম শব্দই তাঁরা পাবেন। কিন্তু ব্যবহারিক বাংলা অভিধান-এ শব্দের ওই সব রূপ ধরে খুঁজতে গেলে অনেক শব্দই পাওয়া যায় না। বিবর্তনমূলক অভিধান করতে গিয়ে তিনি কীভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করেছেন জানতে চাইলে গোলাম মুরশিদ বললেন, 'আসলে খুব সহজ সমাধান ছিল না আমার কাছে। আমরা যা করেছি তা হলো, শব্দের ডান দিকে অর্থাৎ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যেসব শব্দ তৈরি হয়, সেগুলো বইয়ের ভেতরে নিয়ে এসেছি। যেমন 'বাদ'। 'বাদ' কথাটির সংস্কৃত অর্থ হচ্ছে বাচ্য, একটা শব্দ বা কথা। এটা থেকে আসছে 'বাদী'—এ রকম হতে পারে। 'জ্ঞান' থেকে 'জ্ঞানী', 'জ্ঞানগম্ভীর'। বাদ থেকে বাম দিকে এলে 'সংবাদ', 'সাংবাদিক', 'সাংবাদিকতা'—এ রকম করে শব্দ বড় হয়ে গেছে। যেমন 'গুরু', 'গুরুত্ব', 'গুরুত্বপূর্ণ'। আপনি শুনে অবাক হবেন রবীন্দ্রনাথের তৈরি করা শব্দ আমরা নিয়েছি ২৫ থেকে ৩০ হাজার। কিন্তু গোটা রবীন্দ্রনাথে কোথাও 'গুরুত্বপূর্ণ' শব্দটি পাওয়া যায়নি। এটি পাওয়া গেল ১৯৪১ সালের দিকে। রবীন্দ্রনাথ মারা যাওয়ারও পরে। যে শব্দটি না হলে আমাদের এখন জীবন চলে না, সেই শব্দটিও প্রথম ব্যবহার হলো ১৯৪১ সালে। ধরা যাক, আমি একটা শব্দ ব্যবহার করেছি 'পাদটীকা কণ্টকিত'। নিজের কাজের প্রয়োজনে আমরা এভাবে শব্দ গঠন করি। যদি সেটা আরও দু-চারজন গ্রহণ করে তাহলে চালু হয়ে যায়। বিবর্তনমূলক অভিধানের মধ্যে সোয়া লাখ শব্দের মতো আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি।'

একই শব্দের রূপান্তরিত রূপগুলোর ক্রম কীভাবে করা হয়েছে?

'আমরা অভিধানটি যেহেতু অ-কার আধিক্রমে সাজিয়েছি; সুতরাং অ-কার আধিক্রমে সাজাতে গিয়ে শব্দের ডান দিকে যেগুলোর বৃদ্ধি হয়েছে, সেগুলো মূল শব্দের সঙ্গে আমরা নিতে পেরেছি। কিন্তু বাঁ দিকে যেগুলোর যুক্ত হয়েছে (উপসর্গ), সেগুলো কিন্তু আমরা নিতে পারিনি। সেগুলো আলাদা শব্দ হিসেবে নিতে হয়েছে।'

যাঁদের লেখা থেকে শব্দ খোঁজা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে পুরুষ লেখকই বেশি থাকার কথা। তবে গোলাম মুরশিদ তো নারীদের নিয়েও গবেষণা করেছেন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁর কাছে জানতে চাইলাম শব্দ নেওয়ার ব্যাপারে বাংলা ভাষার আদি নারী লেখকদের উপস্থিতি কেমন? বললেন, 'আমরা সবচাইতে পুরোনো যে নারী লেখকের লেখা থেকে শব্দ নিয়েছি, তিনি রাসসুন্দরী দেবী, ১৮১০ সালে তাঁর জন্ম। তারপর নিয়েছি কৈলাসবাসিনী দেবীর লেখা, তাঁর জন্ম ১৮৩৭ সালে। এ ছাড়াও আমরা শব্দ নিয়েছি জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কৃষ্ণভামিনী দাস ও বেগম রোকেয়ার লেখা থেকে।'

আমার কৌতূহল ছিল এই নারীদের লেখায় শব্দ ব্যবহারের কোনো ভিন্নতা পাওয়া গেছে কি না তা জানার।

লেখকবৃন্দ

প্রিয় লেখক খুঁজে নিন

জনপ্রিয় পোস্ট

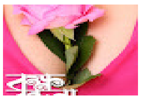

৪৫টি বইয়ের লিঙ্ক এক সাথে।


৫০টি কবিতার বই


[ছোটগল্প] সেক্সবয় - তসলিমা নাসরিন


প্রথম আলো - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (দুখন্ড একত্রে)

সংস্কৃতি-কথা - মোতাহের হোসেন চৌধুরী


বক্ষ-বন্দনা - রাবেয়া মঈন


সংকলনঃ সিনেমা/নাটক/থিয়েটারের বই


মাংস - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (ছোটগল্প)

তিনি খুব একটা ভালো খবর দিতে পারেননি। বললেন, বেগম রোকেয়া ব্যবহার করেছেন কিছু শব্দ। কৃষ্ণভামিনীও করেছেন কিছু। সত্যিকারার্থে নারীবাদী শব্দের ব্যবহার এঁদের রচনায় পাইনি। হয়তো তসলিমা নাসরিনের লেখায় পাওয়া যেত। যেমন তসলিমা নাসরিন যখন বলেন 'মেয়েবেলা'—এটি একটি নতুন শব্দ। বোঝা যায় যে একটা জেন্ডার সচেতনতার বিষয় এখানে রয়েছে। যাঁদের লেখা থেকে শব্দ নিয়েছি, তাঁদের লেখায় এ ধরনের শব্দের ব্যবহার আমরা পাইনি। এ প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলা যায়। আমরা ১৯৭২ সাল পর্যন্ত লেখকদের লেখা থেকে শব্দ নিয়েছি। তার পরবর্তী সময়ের শব্দ নিইনি। কারণ, এর পরবর্তী সময়ে শব্দের ঐতিহাসিক বিবর্তন খুব একটা হয়নি। আমরা ৪০ বছরের একটি সীমারেখা করেছিলাম, যেটির কারণে মূলত আমরা '৭২-এর পরের লেখাগুলো নিতে পারিনি। এই অভিধানটি যদি প্রতিনিয়ত আপডেট করা হয়, তাহলে আমি খুব খুশি হব।'

এ রকম একটা অভিধানের জন্য সব লেখকের সব লেখা পাঠ করতেও অনেক সময় দরকার। কিন্তু সময় ছিল খুবই কম। কিন্তু সব মিলিয়ে কি আপনার নিজের প্রত্যাশিত মানকে স্পর্শ করতে পেরেছে অভিধানটি?

কোনো দ্বিধা না করেই তিনি বললেন, 'আমি নিজের কাজ নিয়ে কখনোই সন্তুষ্ট না। আমার অসম্ভব অতৃপ্তি আছে যে বইটা আমি যেমন স্বপ্ন দেখেছিলাম তেমনভাবে করতে পারিনি। আমার স্বপ্ন ছিল অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারির মতো একটা অসাধারণ কিছু পাওয়া যাবে, যার মধ্যে অনেক বেশি শব্দ ও অর্থের রূপান্তর থাকবে। আমরা মধ্য যুগে যেসব বই ছাপা হয়েছে সেগুলো ব্যবহার করেছি। যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আমরা পুরো ব্যবহার করেছি। কিন্তু এর পরে আমরা বৈষ্ণব পদাবলী পুরো ব্যবহার করতে পারিনি। সেটিতে যেই শব্দটি পাওয়ার কথা ছিল, সেটি পেয়েছি হয়তো আলাওলে। এভাবে আমরা ঘাটে ঘাটে জাল ফেলেছি। কিন্তু যেই শব্দটা আরও আগে পাওয়ার কথা ছিল, সেটি আমরা পাইনি। যেহেতু আমাদের সময়ের অভাব ছিল। তাই আমরা সমস্ত ট্রেস করতে পারিনি।'

আপনি সাহিত্যের অধ্যাপক। কিন্তু আপনার কাজ সামাজিক রূপান্তরের ইতিহাস নিয়ে। একজন সাহিত্যিক হয়ে ইতিহাসের বিবর্তন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে যে দুই বিদ্যার একটা বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, আপনি কীভাবে সেটি সামাল দিয়েছেন—প্রশ্ন করলাম তাঁকে। বললেন, 'সামাল দিতে পেরেছি কি না সেটা আলাদা কথা। আমি পিএইচডি করেছি বঙ্গবিদ্যার একজন বিখ্যাত অধ্যাপক ডেভিড কফের অধীনে, যিনি একজন ঐতিহাসিক। আমার ডিগ্রি হয় ১৯৭৪ সালে। আমি তখন থেকেই চেষ্টা করেছি কীভাবে সময়ের ঢেউয়ের সঙ্গে একেকটা জিনিস বিবর্তিত হয় তা লক্ষ করতে। যেমন, ষোড়শ শতকে একটি ঢেউ এসেছিল বৈষ্ণব পদাবলী লেখার। আমরা ওই যুগটাকে বলি বৈষ্ণব পদাবলীর যুগ। তারপরে একটা যুগ এল মঙ্গলকাব্যের যুগ। তারপর একটা যুগ এল যেটি না আধুনিক, না পুরোনো। তারপর ১৯শ শতকে দেখা যায় ইংরেজদের প্রভাবে কীভাবে সাহিত্য আধুনিক হয়ে উঠল। এভাবে ইতিহাসে মধ্যে আমি খুব আনন্দ পাই। যেমন আমার একটি বই আছে পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা। আমি সেখানে দেখাতে চেষ্টা করেছি কীভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি মানুষের অ্যাটিটিউড বদলে যায়। আমার ধারণা, এমন তথ্যভিত্তিক মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠিত হওয়ার ইতিহাস আর কেউ লেখেননি। আমি আসলে তথ্যভিত্তিক ইতিহাস লিখতে খুব পছন্দ করি। ১৯৭৪ সালে দেওয়া বক্তৃতায় তপন রায়চৌধুরীর কাছ থেকে প্রথম ইতিহাসের নানা বিভাগ—সমাজের ইতিহাস, সংস্কৃতির ইতিহাস, নারীদের ইতিহাস, উদ্বেগের ইতিহাস, ধারণার ইতিহাস ইত্যাদি সমপর্কে জানতে পারি। তার আগে পর্যন্ত মূর্খ ছিলাম। জানতাম, ইতিহাস মানেই হলো সন-তারিখ আর রাজা-মহারাজাদের ইতিহাস।'

তাঁর হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি বইটি ইতিমধ্যে বহুল প্রচারিত। কিন্তু এই বই সম্পর্কে ইতিহাস-শাস্ত্রীদের মনোভাব কী জিজ্ঞাসা করলাম তাঁকে, 'আপনার কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক হয়নি?' তিনি বললেন, 'বিতর্ক যতটা পেয়েছি তার থেকে আমি নিজে আবিষ্কার করেছি নতুন অনেক জিনিস। যেমন, বইটির শেষ অধ্যায়ে লিখেছিলাম, বাঙালি নারীদের মধ্যে এখনো বিবাহপূর্ব যৌনতা নেই বললেই চলে। আমি এটি লিখেছি লন্ডনে বসে। আমি যখন আরও ঘন ঘন বাংলাদেশে আসা শুরু করলাম, তখন লক্ষ করলাম ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপকভাবেই এই প্রবণতাটি দেখা গেছে। আমি যখন '৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বের হই তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনকার মতো প্রকাশ্য প্রেম ছিল না। আমি ঢাকায় এসে যখন আবিষ্কার করলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক হারে প্রেম-ট্রেম ইত্যাদি চলছে, তখন পাবলিশারকে ফোন করে বললাম বইটির নতুন সংস্করণ ছাপবেন না, আমি আরেকবার রিভাইজ করব। বাংলাদেশে ফিরে আরও কতগুলো প্রবণতা লক্ষ করলাম। যেমন, নারীদের একটি অংশ স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, তাদের আর শুধু রান্নাঘরে পাঠানো মুশকিল হবে। একসময় রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি তো প্রায় বিংশ শতাব্দীজুড়ে বাস করেছেন। তো, আপনি কোথায় সবচেয়ে বড় পরিবর্তন লক্ষ করেছেন? তিনি আমায় বলেছিলেন, মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে। আমাদের সময়ে আমরা যৌবনে যেমন নম্র, শাড়ি পরিহিতা, ভদ্র মেয়েদের দেখতে পেতাম—সেটি এখন নেই। এখন সমপূর্ণ অন্য অবয়বে মেয়েদের দেখতে পাই। কাজেই অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে।'

.গোলাম মুরশিদের লেখালিখির খবর যত দূর জানি, তাতে ইতিহাসের শাস্ত্রীরা তাঁর এসব বই সম্পর্কে তেমন প্রতিক্রিয়া দেখাননি—এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে অকপটে কথাটি স্বীকারও করলেন তিনি, 'কোনো সাড়া পাইনি। তাঁদের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হয়েছে তাঁরা ইতিহাস জানেন না। তাঁদের কাছে ইতিহাস মানে আজও সন-তারিখ। তাঁরা ইতিহাসের বিবর্তনকে দেখেন না। ইতিহাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং সাহিত্যের তাবৎ ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এসেছে তাঁরা এটি দেখেন না। আমাকে এ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো একজন অধ্যাপক কোনো পজিটিভ ফিডব্যাক দেননি, বলেননি যে আপনার হাজার বছরের বাংলা সংস্কৃতি পড়ে আমরা উপকৃত হলাম।'

নজরুলচর্চা তাঁর গবেষণার নতুন ক্ষেত্র হতে যাচ্ছে! তিনি লিখতে শুরু করেছেন কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী; এবার তাই আলাপের প্রসঙ্গ সেই দিকে ঘুরে গেল।

নজরুল-জীবনী প্রসঙ্গে নিজের ভাবনা তিনি পরিষ্কার করলেন এভাবে—আমার মনে হয়েছে, মধুসূদনের মতো নজরুল-জীবনীও একটা ব্যর্থতায় প্রবেশিত। মধুসূদনের জীবনী যেমন লেখা হয়েছিল কিংবদন্তির ওপর ভিত্তি করে, নজরুল-জীবনীও লেখা হয়েছে তাঁর বন্ধুদের কথা শুনে—কাজেই এটি যথার্থ তথ্যভিত্তিক নয়। মধুসূদন ও নজরুল দুজনই ব্যক্তি হিসেবে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। জীবনী লেখার জন্য নজরুলকে তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের কারণেই বেছে নিয়েছি আমি। আরও কয়েকটি কারণ আছে—যেমন, নজরুলের একটি তথ্যমূলক জীবনী লিখতে চাই আমি। তাঁকে দেখতে চাই, তিনি মানুষ ছিলেন—এই দৃষ্টিকোণ থেকে; মুসলমান ছিলেন এই দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। এই কাজটি করতে আমার বছর তিনেক লাগবে বলে মনে হয়। আমি যেটি করতে চাই সেটি হচ্ছে, নজরুলের জীবনের কোথাও বিতর্ক থাকলে সেই বিতর্কের কথা আমি উল্লেখ করতে চাই। এ ক্ষেত্রে আমার নিজের সিদ্ধান্ত আমি পরে দেব। দ্বিতীয় কথা হলো, আমি কোনো অর্থহীন কথাবার্তা উপস্থাপন করতে চাই না।

তাঁর রচনার বিবর্তন ও মানসিকতার বিবর্তনকে দেখতে চাই আমি। আরও যেটি দেখতে চাই সেটি হচ্ছে, নজরুল পাগল ছিলেন না। তিনি যেসব কথা বলেছেন তার মধ্যে পরসপরবিরোধিতা থাকলেও এই পরস্পরবিরোধিতার মধ্যেও একটা ঐক্য আছে। বিভেদের মধ্যে ঐক্য আছে। আমি হয়তো আমার বইয়েরই নাম দিতে পারি 'বিভেদের মধ্যে ঐক্য'। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দিই, নজরুল মুসলমানের গান লিখেছেন, কীর্তন লিখছেন, আবার শাস্ত্রসংগীতও লিখেছেন। তাহলে কী বুঝব আমরা? লোকটা কি পাগল? তিনি ফরমায়েশ অনুযায়ী তিন রকমের গানই সমান দরদ দিয়ে লিখেছেন? কারণটা কী তাহলে? আমার ধারণা, তিনি একজন ভক্ত ছিলেন। নজরুল সম্পর্কে এই কথা কিন্তু কোনো জীবনীকারই লেখেননি। আপাতত আমার নজরুল-জীবনী লেখার মূল ভাবনা হলো 'বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত'। নজরুল জীবনীর বহু পর্যায় আছে—কলকাতা ফেরার আগে নজরুল এক রকম, কলকাতা ফেরার পর ১৯২৯ সাল পর্যন্ত আরেক রকম, আবার ১৯২৯ থেকে '৪১-৪২ সালের দিকে নজরুলকে দেখতে পাই অন্য এক রূপে। কাজেই এই কবির জীবনীর অনেক ধাপ, যেন অনেক জীবনী।'

নজরুল-জীবনী লেখার ব্যাপারে গোলাম মুরশিদকে মনে হলো বেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। তাঁর কণ্ঠে ফুটে উঠল দৃঢ়তা, 'আমি আসলে একটি বিষয় চিন্তা করে রেখেছি, আমার লেখা নজরুল-জীবনীটি বিতর্কিত হবে মনে করে এখানে কেউ যদি প্রকাশ করতে না চান, তাহলে জীবনীটি আমি কলকাতা থেকে প্রকাশ করব। কিন্তু আমি কোনো প্রকারের কমেপ্রামাইজে যাব না।'

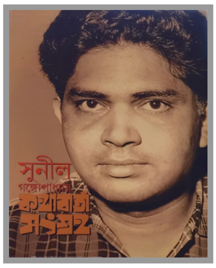
গোলাম মুরশিদ কথা বলছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি এক দৃঢ়চেতা মানুষের অবয়ব।

প্রথম আলো থেকে সংগ্রহিত।

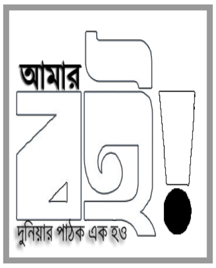
Related books you might like to see :



হুমায়ুন আজাদ সাক্ষাৎকার



সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথাবার্তা সংগ্রহ...



সাক্ষাৎকার - আলোলিকা মুখোপাধ্যায়



কথা সাহিত্যিক সুরঞ্জন প্রামাণিকের স...

Labels: Gulam Murshid, গোলাম মুরশিদ, সাক্ষাৎকার

0 Comments আমারবই.কম Disqus' Privacy Policy Login

Favorite 1 Tweet Share Sort by Best

Start the discussion…

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS ?

Name

Be the first to comment.

Subscribe Add Disqus to your siteAdd DisqusAdd Do Not Sell My Data